# মডিউল-১৬

**কোর্সকোড- BENG-H-GE-T-2**

**কোর্স নাম -বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।**

**আধুনিক যুগ: গদ্যের বিকাশ থেকে সাময়িকপত্র ও ভাষাতত্ত্ব।**

**মিলন মণ্ডল**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

## একক ১৬ : সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

**গঠন**

**১৬.১. উদ্দেশ্য**

**১৬.২. প্রস্তাবনা**

**১৬.৩. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা**

**১৬.৪. সারাংশ**

**১৬.৫. আদর্শ প্রশ্নমালা**

**১৬.৬. উত্তর সংকেত**

**১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি**

### ১৬.১ উদ্দেশ্য:

এই এককটি পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকারা
বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার উদ্ভব ও প্রয়োগবিধির সাধারণ সূত্রগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

### ১৬.২ প্রস্তাবনা:

বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার কীভাবে সৃষ্টি হ'ল, তার সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাংলা গদ্যে, বিশেষ করে দুটি ধারা কীভাবে কেন তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানে কোন ধারাটির অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়েছে সে ইঙ্গিতও এখানে রয়েছে।

### ১৬.৩ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা:

সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষার পার্থক্য নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। এর কারণ হল বিখবার ভাষা উপস্থিত, নিকট দূর প্রত্যেকের জন্য। মুখের ভাষা কেবল উপস্থিত জনের

জন্যই ব্যবহৃত। পরিসর বড় বলে লেখার ভাষার শব্দভাণ্ডার সুবৃহৎ। তাছাড়া লিখবার ভাষায় ওতপ্রোত মিশ্রিত জড়িত থাকে বহুকাল ধরে চলা ঐতিহ্যর ব্যাপারটি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা ভাষায় দুটি আদর্শই বিদ্যমান। একটি হল সাধুভাষা, অন্যটি চলিতভাষা। মুখের ভাষার সঙ্গে লিখবার ভাষায় দূরত্ব আছে। তবে দূরত্বের হেরফের আছে। সাধু-তে বেশি, চলিত-এ কম।

সাধারণভাবে আমরা তিন ধরনের বাক্রীতি অনুসরণ করে থাকি। একটি লিখবার, একটি শিষ্ট কথ্যভাষার, অন্যটি উপভাষার। বাংলার মতো ভাষা, যেখানে কমবেশি পাঁচটি উপভাষা আছে, সেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লেখাপড়ায় বব্যহারের যে ভাষা তার মূলে থাকে বিশেষ একটি উপভাষা। অন্য উপভাষার শব্দ বা বাক্যবিধিতে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসুবিধে নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি উপভাষারই প্রাধান্য ঘটে। সে ভাষা যদি রাজধানীর ভাষা হয়, লেখক-সাহিত্যিক যদি সেই ভাষাতেই লেখেন তাহলে এমনটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষার যে সর্ববাদি সম্মত প্রতিষ্ঠা ঘটল তা এই কারণেই। তবে অন্য উপভাষার ছাপ যে ভাষায় কিছুমাত্র পড়েনি সে কথাও অসঙ্গত। ড. সুকুমার সেন-এর মতো ভাষাবিদের বক্তব্য হল যে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁদের লেখায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপভাষার ছাপ পড়েছে। আমাদের ধারণা, মুখে ব্যবহৃত ‘করছি’ পদের সাধুরূপ হল ‘করিতেছি’। এটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের উপভাষার পদ।

বাংলা  ভাষার একেবারে প্রথম পর্বে লেখার ও মুখের ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য কিছু ছিল না। সামান্য যা কিছু তৎসম শব্দাশ্রী, প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ পদ বা বাগ্ধারার সীমিত প্রয়োগ নির্ভর। তখন অপভ্রষ্ট-এর সঙ্গেই বাংলার সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। চর্যার কোনো কোনো পদকার এ ভাষায় পদও রচনা করেছিলেন। সরহ এ রকম একজন পদকার।

মধ্য বাংলায় কথ্যভাষা সাহিত্যসৃষ্টি থেকে অবশ্যই পার্থক্য বজায় রাখছিল। সে সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ রচনা, সাধারণ মানুষ এর লক্ষ্য এবং উপভোক্তা। মুখের ভাষাও সেখানে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। ছন্দের স্বার্থেই সাহিত্যের ভাষায় পুরানো নতুন শব্দ পদ বা বাগ্ধারায় পর্যাপ্ত ব্যবহার হত। সুধাভাষু আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে সূচনা পর্যন্ত। মুখের ভাষা এবং সাধুভাষায় বিরাট কোনো ভিন্নতা কিছু ছিল না। মুখের ভাষায় স্বরধ্বনিতে বিশেষ করে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার ভিন্নতা। ভিন্নতার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা শক্ত। ছন্দের দরকারেও মুখের ভাষার প্রবেশ ছিল নির্বাধ। সবচেয়ে বড় কথা মুখের ভাষা কেমন ছিল তারও কোনো নিদর্শন কিছু রক্ষিত নেই। দলিল-দস্তাবেজে সংস্কৃত এবং ফারসিরই অবারিত বিকার।

সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাংলা এবং বর্তমান সাধুভাষার সম্পর্ক যে কত নিবিড় ভাষাবিদেরা তা দেখিয়েছেন। যেমন:

‘এ সব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে॥’

বা,

‘দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥’

এইরকম উদাহরণ অজস্র।

সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পণ্ডিত এবং ফারসি জানা মুন্‌শিদের হাতে। তাঁরা সকলের কাছেই বোধ্য একটি সাধারণ খিবার ভাষা তৈরি করতে য-নিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপরেই এঁরা নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ‘বেদান্তগ্রন্থ’-এ রামমোহন ‘সাধুভাষা’ শব্দটির সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ মানুষদের ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি সাধুভাষা বলে বিশেষিত করেছিলেন। এর পাশে মুখের ভাষার নাম ছিল ‘অপরভাষা’। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ‘‘কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাংলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা অপরটির নাম ‘অপর ভাষা একটি লিখিবার ভাষা দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাংলা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সহিত যুক্ত হইত। ... অপর ভাষা সেদিকে না গিয়ে, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।’’ বঙ্কিম পরিষ্কারভাবেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, সংস্কৃতাশ্রয়ী সাধুভাষার অবিরাম লেখন ও অনুশীলনের ফলে বাংলা গদ্য যে ব্যাকরণ ও অভিধাননির্ভর হয়ে কিছুটা জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিল, এ কথা ঠিক। মুখের ভাষাকে লেখার মধ্যে আনবার চেষ্টা এরই প্রতিবিধানকল্পে। প্যারীচাঁদ বা কালীপ্রসন্ন সিংহরা এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে স্বয়ং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর পুরুষেরা এগিয়ে আসেন। উপভাষার গণ্ডী পার হয়ে কলকাতার ভাষাই অতঃপর হয়ে উঠল সর্বজনসম্মত শিষ্ট চলিত ভাষা (Standard Coloquial)। একটি বিশেষ অঞ্চলে চলিত কথা বলবার ভাষা অবলম্বনে এর সৃষ্টি বলে এর নাম ‘চলিত ভাষা’। সাধুভাষার সহেগ এর সবচেয়ে বড় ভিন্নতা সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপে। বাংলা চলিত গদ্যে অপিনিহিতি-এর ব্যবহার নেই। পরিবর্তে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিরই ব্যবহার। এও লক্ষণীয় যে সাধুভাষায় অপিনিহিতি-র আগের যুগের ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু ক্রিয়াপদের উদাহরণ:
করিতেছি—করছি
করিতেছিলাম—করছিলাম
করিয়াছি—করেছি
করিয়াছিলাম—করেছিলাম
করিতে—করতে
করিয়া—করে

করিলে—করলে

সর্বনাম পদের উদাহরণ:
যাহার—যার, তাঁহার—তাঁর
যাহাদিগের—যাদের, তাঁহাদিগের—তাঁদের
ইহা-এ/এটি

এইরকম, সাধু ভাষার রূপ যেখানে 'বলিয়া', পূর্ব বাংলায় অপিনিহিতি-তে যেটি হয়েছে 'বইল্যা', চলিত ভাষার অভিশ্রুতির পর রূপান্তরিত প্রয়োগ—'বলে'। স্বরসঙ্গতি-র আশ্রয়ে 'দেশী' হয়েছে 'দিশি', 'বিলাতি' —'বিলিতি'। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য :

১. চলিত ভাষায় দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা। যেমন: কর্ব, করিতেছি—করছি।
২. হ-স্বরের লোপপ্রবণতা। যেমন: মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।
৩. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার। যেমন: মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।
৪. সমীভবন প্রবণতা। যেমন: যতদিন—যদ্দিন, গল্প-গপ্পো।
৫. স্বরাগম। স্কুল—ইস্কুল, স্পর্ধা—আস্পর্ধা।
৭. অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব শব্দের বিপুল ব্যবহার।
৮. অন্ত্য ও মধ্য স্বরের লোপ প্রবণতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে না দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা আর একটাকে কথ্যভাষা; কেউ বলে চল্‌তি ভাষা; আমার কোনো কোনো লেখায় বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।

তবে এই আটপৌরে সাজাকেও একটু গুছিয়ে তুলতে হয়। কেননা অবিকল মুখের ভাষায় সাহিত্য হয় না।'

## ১৬.৪ সারাংশ:

সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা বাংলা গদ্যে বিশেষ করে দীর্ঘকালের এক বাস্তব সত্য। বর্তমান এককে ইতিহাসের পরম্পরাতেই তার উদ্ভব ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সাধু ও চলিত ভাষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণও।

## ১৬.৫ আদর্শ প্রশ্নমালা:

**১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:**

(ক) আমরা ক'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করে থাকি?
(খ) 'চর্যাপদ'-এ কি লিখবার ভাষা ও মুখের ভাষায় কোনো পার্থক্য ছিল?

(গ) সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি কোন্ সময়ে?

(ঘ) কোথায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়?

(ঙ) মুখের ভাষার কী নাম ছিল?

**২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:**

(ক) প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় সাধু ও চলিত ভাষার অস্তিত্ব কীভাবে ছিল আলোচনা করুন।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহারের কয়েকটি দিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করুন।

## ১৬.৬ উত্তর সংকেত:

১. (ক) তিন ধরনের বাকরীতি অনুসরণ করি।

(খ) কোনো পার্থক্য ছিল না।

(গ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

(ঘ) 'বেদান্ত' গ্রন্থে রামমোহন প্রথম ব্যবহার করেন।

(ঙ) মুখের ভাষার নাম ছিল 'অপর ভাষা'।

২. (ক) ১১.৩ অংশ দেখুন।

(খ) ১.৩ অংশ দেখুন।

## ১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি:

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়–ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

২. পার্বতী ভট্টাচার্য–বাংলা ভাষা।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম)।

৪. ড. রমেশ্বর শ–সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।